**KOBOR**

মুনীর চৌধুরী রচিত "কবর" নাটকটি বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য প্রতীকধর্মী নাটক, যা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবাদের অনন্য নিদর্শন। এই নাটকটি এক অঙ্কবিশিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যরচনার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক উদ্ভাসিত হয়েছে, যা শুধুমাত্র রচনাশৈলীর জন্য নয়, বরং নাটকের মূল বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও একেবারে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ছিল। নাটকটি কারাগারে বসে রচিত হয়েছিল, যেখানে লেখক শারীরিক ও মানসিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিলেন। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ ও জটিল নাট্যরূপ দেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর নাটক রচনার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এক অঙ্কবিশিষ্ট হওয়ার কারণে নাটকটি সীমিত চরিত্র, দৃশ্য এবং সংলাপের মধ্য দিয়েই একটি ব্যাপক রাজনৈতিক ও দার্শনিক বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে।

"কবর" নাটকের মূল পটভূমি একটি কবরস্থান, যেখানে মৃত চরিত্ররা জীবন্তের মতো কথা বলে। এখানে ভাষা আন্দোলনের শহীদরা জীবন্ত হয়ে ওঠেন, এবং এক প্রতীকী রূপে শাসকের মিথ্যাচার, অত্যাচার, এবং ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এই প্রতীকী ও বিমূর্ত উপস্থাপনার জন্য এক অঙ্কের সীমিত কাঠামো যথার্থ। নাটকটিতে যেমন মৃত মিন্টু শহীদের আদর্শের প্রতীক, তেমনি সরকারি কর্মচারী চরিত্রটি শাসকগোষ্ঠীর অন্ধ আনুগত্য ও মিথ্যাচারের প্রতিচ্ছবি। এক অঙ্কে এই সব প্রতীকী বার্তা একত্রে উপস্থাপন সহজ হয়েছে এবং দর্শক বা পাঠকের মনোযোগ বিঘ্নিত না হয়ে নাটকের কেন্দ্রীয় বক্তব্যে কেন্দ্রীভূত থাকতে পেরেছে।

এছাড়া, নাটকটি এক অঙ্কবিশিষ্ট হওয়ার ফলে মঞ্চায়নেও একধরনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এটি অল্প সময়, সীমিত বাজেট ও পরিসরে মঞ্চায়নযোগ্য, বিশেষ করে শহীদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মতো দিনে সহজে উপস্থাপনযোগ্য। নাট্যকর্মীরা নাটকটি একটি দৃশ্যে উপস্থাপন করে দর্শকের মনে গভীর প্রভাব ফেলতে পারেন, যা দীর্ঘ নাটকে সবসময় সম্ভব হয় না। এক অঙ্কের নাটক হওয়ায় এর গঠন কষাকষিভাবে পরিপাটি, বার্তাগুলো সরাসরি, এবং নাটকটির নাট্যগত সৌন্দর্য ও গভীরতা বজায় থাকে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, "কবর" নাটকটি এক অঙ্কবিশিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে এর নাট্যশৈলী, বার্তার গভীরতা, প্রতীকী উপস্থাপনা ও প্রভাব বিস্তারের শক্তি অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি কেবল নাট্যরচনার একটি কৌশল নয়, বরং নাটকের বার্তা সফলভাবে পৌঁছে দেওয়ার একটি শিল্পও বটে। মুনীর চৌধুরী তার সময়, প্রেক্ষাপট, ও প্রতিবাদের ভাষাকে যে নিপুণতায় এক অঙ্কে তুলে ধরেছেন, তা এক কথায় সাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী কাজ।

**OPOGHAT**

বিষয়ের শিরোনাম: অপঘাত গল্পের সারসংক্ষেপ  
  
পটভূমি : গল্পটি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত।  
  
অপঘাত" গল্পটি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একটি বিখ্যাত ছোট গল্প, যা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। গল্পটির মূল বিষয়বস্তু হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কার এক নির্মম বাস্তবতা, যেখানে দেবডাঙ্গা গ্রামের ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলীর ছেলে, বুলু, শহীদ হয়। গল্পটি মূলত বুলুর অপঘাত বা আকস্মিক মৃত্যু এবং তার বাবা মোবারকের শোক ও উদ্বেগকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।  
  
‘অপঘাত’ ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামের গল্প। ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানি মোবারক আলির কলেজ-পড়ুয়া ছেলে বুলু দেবডাঙ্গা গ্রামে শহীদ হয়। সে একটা ব্রিজের ওপরে উঠতে থাকা সৈন্যদের জিপে গ্রেনেড ছুঁড়েছিল। তখন গুলাগুলির সময় বুলুর বুকে দু’টো গুলি বেঁধে এবং সাথে সাথেই বুলু মারা যায়। এ খবর বুলুর জনৈক সহযোদ্ধা মোবারক আলির কাছে পৌঁছে দিতে গেলে শোকে কান্নাকাটি করেই চলে বুলুর মা, ‘একবার চোখের দ্যাখাটাও দেখবার পারনু না গো! কোটে কোন পাথারের মধ্যে একলা দাপাদাপি কর‌্যা মরলো, মুখোত এ্যানা পানিও পালো না গো। হামার ব্যাটার উপরে ইঙ্কা গজব কিসক পড়লো গো? আল্লার বিচার ক্যাঙ্কা কও তো? তার মাটিও হয় না, কোটে কোন কাদোর মধ্যে পড়্যা থাকে, কও তো!’ কিন্তু সশব্দে কান্নাকাটি করা চলবে না যেহেতু তখন ইউনিয়ন কাউন্সিলের অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে এসে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাড়ি বয়ে তদন্ত করতে আসতে পারে, সবার জানও চলে যেতে পারে। তবে বুলুর মা’র এই অবরুদ্ধ অশ্রু মুক্ত হয় যখন চেয়ারম্যানের ছেলে শাজাহান জ্বরে ভুগে মারা যায়। সেটা ছিল স্বাভাবিক মৃত্যু-- বুলুর মতো অপঘাতে মরণ নয়। শাজাহানের লাশের সামনে গিয়ে বিলাপ করবার সুযোগ পায় বুলুর মা যেন সে তার মৃত সন্তান বুলুর মৃত্যুর জন্যই আহাজারি করছে! শাজাহানের লাশ পাকিস্তানি সৈন্যদের বাঁধার মুখে গোর দেয়া হয়। তারপরে ভয় কেটে যায় মোবারকের। সে জনে জনে ডেকে তার ছেলের গৌরবান্বিত মৃত্যুর কথা বলতে থাকে। সে এ-ও ভাবে, ‘ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?’